সংবাদ

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা দিবসের প্রত্যাশা ও ভাবনা

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'। বাষট্টিতে এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, গণমুখী শিক্ষা প্রসার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য-বঞ্চনা নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে চরম বিমাতা সুলভ, বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার হার দ্রুত কমে যায়। খুব বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল-২৯,৬৩৩। ১৯৫৪-৫৫ সালে তা ২৬ হাজারে নেমে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছিল। ঝরে পড়ার সংখ্যাও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় কম। শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি। যদিও জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই বাস করত পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন, রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় নিষেধাজ্ঞা, নজরুলের কবিতার বিকৃতি শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষুব্ধ করে।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ছাত্র সমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজ থেকে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত ইংরেজিকে বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যুক্ত হয়। প্রথমে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাস বর্জনের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম', নামে রূপান্তরিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এর যুগ্ম আহ্বায়ক হন ছাত্রলীগের আব্দুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম ও ছাত্র ইউনিয়নের কাজী ফারুক আহমেদ। নেতৃত্ব দেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ বাগমার। শুধু শিক্ষা নিয়ে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাইরে থেকে এত বড় আন্দোলন হতে পারে তা ছিল অনেকেরই ধারণার বাইরে। শেষ পর্যায়ে আন্দোলনের কর্মসূচিতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী সক্রিয় উপাদান যুক্ত হয় ও তা সরাসরি পৌঁছে যায় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে।

এ লেখা যখন প্রায় শেষ তখন সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে, সরকার প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর আরোপিত ভ্যাট তুলে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন। সংবাদপত্রের ভাষ্যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় প্রায় কাছাকাছি। তবে পার্থক্য হলো, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় করছে সরকার আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্যয় মেটাতে হচ্ছে তার পরিবারকে। সব মিলিয়ে এক শিক্ষাবর্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজার আসনে ভর্তি হতে পারে শিক্ষার্থীরা। এর বাইরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে দুই লাখ শিক্ষার্থীর। কিন্তু প্রতি বছর কয়েক লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে। তাদের মধ্যে সাধারণত যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না তাদের বড় অংশই ভর্তি হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ৬৩ শতাংশই পড়ে বেসরকারিতে। তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের জন্য সরকারের তরফে কোনো খরচ নেই। এখন ভ্যাট চাপানো হলে এসব পরিবারের খরচের বোঝা আরো বেড়ে যাবে। শিক্ষার্থীরাও মনে করে, 'সরকার দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উচ্চবিত্ত পরিবারের কথা চিন্তা করেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার ওপর ভ্যাট আরোপ করতে চায়। একই দেশে কেউ উচ্চশিক্ষা পাবে নামমাত্র খরচে, আর কাউকে গলাকাটা দাম দিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে হবে, তা হতে পারে না। সবাই তো আমরা এ দেশেরই নাগরিক। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কেন?

সংবাদ মাধ্যমে আমি বলেছি, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সরকারই দেয়। তারা পর্যাপ্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করতে না পারায়ই বাড়ানো হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরও কোনো না কোনো সুবিধা দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের কথা বলেছেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করা অনেক খরচের ব্যাপার। সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সহায়তা দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। কারণ বেসরকারিতে যারা পড়ে তারাও তো আমাদের দেশের সন্তান ও শিক্ষার্থী। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক হলে সেখানে ভ্যাট প্রযোজ্য হয় কীভাবে? তবে কোন প্রতিষ্ঠান লাভজনক হলে ভিন্ন কথা। কেউ অনিয়ম করলে তদন্ত করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। সরকার সে উদ্যোগ নিচ্ছে না কেন?'

এ মাসের ১০ তারিখে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্য, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নামের একটি সংগঠন ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন একশনএইড এর বাংলাদেশ শাখা মিলিতভাবে ঐ সনদ উপস্থাপন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি দলীয় রাজনীতির প্রভাব মুক্ত রাখা, শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ। দাবি সনদে উল্লেখ করা হয় : শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে সরকার থেকে অর্থ ও সম্পদের স্বল্পতা / সীমাবদ্ধতার যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। সরকারের যুক্তিতে সারবত্তা কতটুকু আছে সে বিবেচনায় না গিয়ে শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত হারে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করা প্রয়োজন বিবেচনায় কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে সংগৃহীত কর শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ তার অপরিহার্য শর্ত থাকতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ও অন্তর্বর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের জাতীয় কর্মসূচিতে শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে বিন্যস্ত ও জাতীয়করণ, পাবলিক পরীক্ষার উপযোগিতা নিরূপণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণ, সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ইংরেজি, অংক ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং কর নীতিমালার সহজীকরণ করে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী ম্যানুয়াল প্রণয়ন করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

'শিক্ষা দিবস' : ১৯৬২ থেকে ২০১৫

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'। স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পার হতে চলেছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, এখনও দেশের ৩৯ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। সাক্ষরতার হার আগের তুলনায় ৩ শতাংশ কমেছে। তবে আশার কথা, ইউনেস্কো সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে ২০১৫ সালে সম্ভাব্য যুবসাক্ষরতার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে সেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তানের উপরে, তবে নেপালের চেয়ে পিছিয়ে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের যুব সাক্ষরতার চিত্র এরূপ : ইন্দোনেশিয়া ৯৯.৭, চীন ৯৯.৬, ইরান ৯৯.১, কম্বোডিয়া ৯১.৫, ভারত ৯০.২, নেপাল ৮৮.১, বাংলাদেশ ৮৩.১ ও পাকিস্তান ৭৭.১।

অবশ্য সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকারের ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য পরিসংখ্যানের মধ্যে মিল যেমন নেই, সাক্ষরতা এখন আর আগের মতো শুধু সই করতে জানাও বুঝায় না। পড়তে ও লিখতে পারার সঙ্গে, হিসাব-নিকাশ জানা বুঝায়। বর্তমানে আবার কম্পিউটার সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা কথাটার প্রচলন হয়েছে।

শিক্ষা সকলের প্রিয়

শিক্ষা সকলের কাছে একটি প্রিয় বিষয়। আমি প্রচলিত লক্ষ্যহীন, কর্মসংস্থানের সূত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পক্ষে। আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যা কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরে, মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশাকে ধারণ ও আত্মশুদ্ধিতে বলীয়ান করে। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সংবলিত উচ্চ নৈতিকতা নিশ্চিত করে। এবারের শিক্ষা দিবসে এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা ও ভাবনা।

[লেখক : বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রবীণ শিক্ষাবিদ]
principalqfahmed@yahoo.com